# বাংলাদেশের নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থাঃ একটি তুলনামূলক চিত্র

মাজেদা হোসেন চৌধুরী[১]
শাহনাজ পারভীন[২]

**সারসংক্ষেপ ঃ** পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী বলতে কন্যা, জায়া ও জননী এ তিনটি রূপকেই বুঝানো হয়ে থাকে। একটি শিশু জৈবিকভাবে স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও জন্ম লগ্ন সে জানেনা সে নারী না পুরুষ। সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে পরবর্তীতে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয় এবং তার সামনে ঝুলিয়ে দেয়া হয় নানা রকম বিধিনিষেধ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক আরোপিত এই লিঙ্গ বিভাজন নারীর জন্য বয়ে এনেছে পদে পদে অসাম্য ও বঞ্চনার ইতিহাস। শুধু সমাজ নয়, পরিবারেও মেয়েরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে উন্নত দেশে এই বৈষম্য কমে এলেও বাংলাদেশে এখনও তা প্রকটভাবে বিরাজমান। আজও দেশে পুত্র সন্তানকে 'সম্পদ' এবং কন্যা সন্তানকে 'বোঝা' মনে করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সহায়তা চাইতে গিয়ে তারা পুলিশ কর্তৃকও নির্যাতিত হচ্ছে। পুলিশের কাছে এদেশের আজও অনেক মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হচ্ছে যার ফলে শিশু জন্ম হার এবং মাতৃ মৃত্যুহার এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌছাতে পারেনি। মাতৃত্বের কারণে নারীর শিক্ষা জীবন; চাকুরি জীবন ব্যাহত হলেও সন্তানের অভিভাবকত্ব পিতার, মাতার নয়। সরকারীভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও নারী শিক্ষার হার পুরুষের তুলনায় কম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তার স্বীকৃতি দিচ্ছে না। গৃহস্থালী কাজে দৈনিক ১৬-১৮ ঘন্টা শ্রম দিলেও এ কাজের কোন স্বীকৃতি নেই। নারী ও পুরুষের কাজ এবং মজুরির মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান। উচ্চতর পদে নারী প্রতিনিধিত্ব পুরুষের তুলনায় নগন্য। এমনকি যে ক্ষেত্রগুলো নারী শ্রমিক দ্বারা অধ্যুষিত সেখানেও পুরুষের প্রাধান্য লক্ষ্যনীয়। স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টির ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী হলেও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। এদেশে নারী এবং পুরুষের হার (১০৪ ঃ ১০০) প্রায় এক হলেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত সারণীতে তা লক্ষ্যনীয়। তাই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে– এই দিকটি তুলে ধরাই হচ্ছে এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

---

১. সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২. প্রভাষক, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে নারী অবস্থান কোথায় তা বিভিন্ন পরিসংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায়। সংবিধানে নারীদের সমানাধিকার দেয়া হলেও বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে, সম্পদের উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা যে সকল বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে তা বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা। বাংলাদেশে বিদ্যমান নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে সরকার এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই এ প্রবন্ধের সূত্রপাত।

নারী হয়ে কেউ জন্ম নেয়না, কেউ কেউ নারী হয়ে উঠে বলেছেন সিমেন দ্য বোভোয়া। অর্থাৎ জৈবিকভাবে এক একজন শিশু স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মায় এই টুকুই প্রাকৃতিক সত্য। জন্মলগ্নে সে জানেনা সে নারী না পুরুষ। তার পর প্রতি পদে পদে তাকে টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে পুতুল খেলিয়ে, রান্নাবাটি ধরিয়ে দিয়ে, বাইরে ঘোরা বন্ধ করে, ধর্মীয়- সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয়। তার সামনে ঝুলিয়ে দেয়া হয় কোড অব কন্ডাকটের বিধিনিষেধ। লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা ও বিভাজন আরোপ করে সমাজ। আচার আচরণে সাহিত্যে-দর্শনে, গানে কবিতায় এবং পেশা নির্বাচনে এই লিঙ্গ নির্মাণ চলতে থাকে। এই লিঙ্গ নির্মাণের মুল কৌশল হলো যা কিছু পৌরুষের প্রতীক বলে সমাজ মনে করে তার বিপরীত লক্ষণগুলো দিয়ে হয় নারীত্ব নির্মাণ "মেয়েরা এরকম হবে, আর ছেলেরা ওরকম হবে" এর বাইরে গেলেই সে বিচ্যুত সৃষ্টি ছাড়া ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে এই ধারণা ঢোকানো হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই লিঙ্গ বিভাজন নারীর জন্য বয়ে এনেছে পদে পদে অসাম্য ও বঞ্চনার ইতিহাস। পৃথিবীর সর্বত্রই এক সময় মেয়েরা ছিল বৈষম্যমূলক আচরণের সহায় শিকার। ছেলে আর মেয়েকে কখনো এক করে দেখা হতো না। সমান মনে করা হতো না তাদের। একই পরিবারে ভাই বোনের মধ্যেও ভাই অনেকটা বাড়তি সুবিধা পেতো। উন্নত বিশ্বেও একদা এরূপ লিঙ্গ ভিত্তিক সমাজ ও বৈষম্য বিরাজমান ছিল। শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে উন্নত দেশে এই বৈষম্য কমে এলেও বাংলাদেশে এখনও লিঙ্গ বৈষম্য প্রকটভাবে বিরাজমান। মা বাবার দৃষ্টিতে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান সমান নয়, পরিবারেও সমান নয়। পুত্র সন্তানকে মনে করা হয় সম্পদ (ASSETS) পক্ষান্তরে কন্যা সন্তানকে মনে করা হয় বোঝাস্বরূপ (LIABILITY) এখনও যদি কোন পরিবারের একের পর এক সব কন্যা সন্তান জন্মায় তবে তাকে অনেকটা বংশালোপের মত গণ্য করা হয়। তাই শুধু কন্যা সন্তানের পিতা পুত্র লাভের প্রত্যাশায় চল্লিশোত্তর বয়সেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে কুণ্ঠিত হয় না। স্থানীয় রীতি অনুসারে মুসলিম পরিবারগুলোতে পুত্র সন্তানের জন্ম বার্তা ঘোষিত হয় উচ্চ স্বরে আজান দেওয়ার মাধ্যমে। অন্যদিকে কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র তার কর্নের কাছে ফিস ফিস করে আজানের কথাগুলি উচ্চারণ করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সমতা ঘোষণা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রথমতঃ সংবিধানে বর্ণিত অধিকার নারী পুরুষের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সংবিধান উপলব্ধি করে যে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গণে নারীর অবস্থান অসম। তৃতীয়তঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে যে, অবস্থানগত ব্যাপক অসমতা রয়েছে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংবিধান রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশনার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

ধারা ১০ ঃ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ধারা ২৭ ঃ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধারা ২৮ (১) ঃ কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

ধারা ২৮ (২) ঃ রাষ্ট্রে ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

ধারা ২৮ (৩) ঃ কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাঁধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

ধারা ২৮ (৪) ঃ নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকের কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ২৯ (১) ঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

ধারা ২৯ (২) ঃ কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ন, নারী পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

ধারা ৩২ ঃ আইনানুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ধারা ৬৫ (৩) ঃ নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংবিধানে নারীদের কথা বলা হলেও বাস্তবরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ হতে এর সত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পশ্চাদপদ, অবহেলিত এবং শোষিত।

বাংলাদেশের নারী নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, নারী ও মেয়ে শিশু অপহরণ ও পাচার, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি এসিড নিক্ষেপ ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে ১০১ দোররা বা গর্ত করে পাথর মারা, পুড়িয়ে মারার ঘটনাও এদেশে ঘটেছে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো পুলিশের নির্যাতন। নিকট অতীতে পুলিশের হাতে বেশ কিছু নারী নির্যাতিত হয়েছে। এমনকি পুলিশ দ্বারা নারী ধর্ষিত ও নিহত হয়েছে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনো গড়ে ওঠেনি। এখনো প্রয়োজনীয় নারী কনষ্টেবল, নারী পুলিশ ইনসপেক্টর ও নারী এ এস আই এবং উচ্চতর পদ সোপানে নারী পুরুষ কর্মকর্তা নেই। ফলে নারী বিষয়ের তদন্ত এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয় না এবং বিভিন্ন কারণে বিচার বিলম্বিত হয়।

এদেশে আজও অনেক মেয়ে অল্প বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণ করছে। উচ্চ জন্মহারকে বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রতিকারের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বাহন হিসাবে ধরে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বিবাহিত জীবনও সকল নারীর জন্য নিরাপদ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কোন কারণ ছাড়াই তারা স্বামী পরিত্যক্ত কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের আজও বিবাহের সম্মতির ক্ষেত্রে নারী অধিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যথার্থ নেতিবাচক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের মতামত উপেক্ষা করেই বা না নিয়েই পিতার ইচ্ছাতেই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, গ্রাম, শহর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিয়ের ক্ষেত্রে দেনমোহর, বয়স, বিবাহ, রেজিস্ট্রিকরণ, সাক্ষ্যনামা ইত্যাদি আইনের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক হলেও আজও এদেশের অনেক বিয়ে রেজিষ্টিকৃত হয় না। এর কারণে বিয়ের পর কোন সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টি হলে অনেক দিক থেকে কোন সহায়তা পাওয়া যায় না।

এদেশে সন্তান প্রতি পালনের যাবতীয় ঝামেলাপূর্ণ ও কষ্টকর দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করা হয়। সন্তান জন্ম দানের ফলে পিতৃত্বের সৃষ্টি করে কিন্তু তার জন্যে পুরুষকে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না এবং তার কোন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয় না। পক্ষান্তরে মাতৃত্বের কারণে নারীর শিক্ষা জীবন, চাকরি জীবন ব্যাহত হয়, তারপর ও সন্তানের অভিভাবকত্ব পিতার, মাতার নয়।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। একটি সমাজের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৮ সালের বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কমিশনে নারী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কাগজে কলমে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকলেও বাস্তবে

নারীদের পুরুষের সমান শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই। নারীদের নিরাপত্তা যোগযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণ এদেশের নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে আছে। ইউনেস্কোর (১৯৯৩) এর তথ্যে দেখা যায় বিশ্বের নয়টি অত্যধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নারী শিক্ষার হার নিম্নতম।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সংগতিপূর্ণ উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবের দরুন শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ থেকেই মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তবে ১৯৯৩ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় শিক্ষার্থী তালিকাভুক্তি সঠিকভাবে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

## সারণী- ১

### প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি (১৯৯০-৯৭) লক্ষ

| বছর | মোট | ছাত্র | ছাত্রী |
|---|---|---|---|
| ১৯৯০ | ১২০.৫ | ৬৬.৬ | ৫৩.৯ |
| ১৯৯১ | ১২৬.৪ | ৬৯.১ | ৫৭.৩ |
| ১৯৯২ | ১৩০.২ | ৭০.৫ | ৫৯.৭ |
| ১৯৯৩ | ১৪০.৭ | ৭৫.৩ | ৬৫.৪ |
| ১৯৯৪ | ১৫১.৮ | ৮০.৫ | ৭১.৩ |
| ১৯৯৫ | ১৭২.৮ | ৯০.৯ | ৮১.৯ |
| ১৯৯৬ | ১৭৫.৮ | ৯২.৬ | ৯৩.৬ |
| ১৯৯৭ | ১৮০.৩ | ৯৬.৬ | ৮৬.৭ |

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮ ঃ ৭১

মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ–দশম শ্রেণী) অতীতে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কম হলেও বর্তমানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি ও অবৈতনিক কর্মসূচি চালু করার ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় নারী অংশ গ্রহণের হার অধিকতর নিম্নগামী। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর ২৩ শতাংশ। মেডিকেল কলেজসমূহ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২৯ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ মহিলা। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী শিক্ষার্থী অত্যন্ত নগণ্য মাত্র ৫ শতাংশ। কৃষি ও অন্যান্য পেশা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর ১৪ শতাংশ নারী। অর্থনীতি ও উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে চাইলে উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী বিষয়ে নারীদের শিক্ষার সুযোগ অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।

# সারণী– ২

## বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল, সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং লিঙ্গভিত্তিক ছাত্র সংখ্যা

| বৎসর | মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা | ছাত্রসংখ্যা | | কলেজ সংখ্যা | ছাত্রসংখ্যা | | বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সংখ্যা | ছাত্রসংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | | পুরুষ | মহিলা | | পুরুষ | মহিলা |
| ১৯৭১-৭২ | ৬১৬২ | ১০০৭ | ২৫৪ | ৩৪৭ | ৩৬১৭২৩ | ২৮৯১৯ | ৬ | ১৮৯৬৭ | ২০১৬ |
| ১৯৭২-৭৩ | ৭৯৭৬ | ১১৭৫ | ৩৭৬ | ৩৬৯ | - | - | ৬ | ২০৪৫৪ | ৩২৭৭ |
| ১৯৭৩-৭৪ | ৭৭৯১ | ১৩৪৩ | ৪৯৮ | ৩৫১ | ৩৪৬৫১৬ | ৩৯৭০৪ | ৬ | ২১৯৪২ | ৪৪৪৮ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ৮১৯৩ | ১৪৩৩ | ৩৯০ | ৫৮৮ | ৩৭৭৮০১ | ৪৩৩১৯ | ৬ | ২৫২৪৬ | ৪৭২০ |
| ১৯৭৫-৭৬ | ৮৩২৭ | ১৪৭২ | ৪৯২ | ৬১১ | ৩৩০৯৫৩ | ৫০০২০ | ৬ | ২৬৮৮৪ | ৬৪২৮ |
| ১৯৭৬-৭৭ | ৮৭৯৪ | ১৫০৫ | ৪৫৫ | ৬১১ | ২৫১১৫২ | ৩৭৫৫৫ | ৬ | ২১২৪০৩ | ৪৬৫৮ |
| ১৯৭৭-৭৮ | ৮৯৪৫ | ১৩৮৩ | ৪৫০ | ৬১১ | ২৫১১৫২ | ৪১২৯৩ | ৬ | ২০৪৪৩ | ৪৫৯১ |
| ১৯৭৮-৭৯ | ৭৯৪৬ | ১৭৪২ | ৫৯৭ | ৫৯২ | ২৯৫১১০ | ৩৯১৭০ | ৬ | ২৩১১৬ | ৫৩২০ |
| ১৯৭৯-৮০ | ৭৯৮১ | ১৭৫৯ | ৬১০ | ৬০০ | ২৭৫৭৯১ | ২৯৬৮০ | ৬ | ২৪৯২৩ | ৫৭৭৬ |
| ১৯৮০-৮১ | ৮০২০ | ১৭৭৮ | ৬২৭ | ৫৯৯ | ২০৮৯০০ | ২৯৯০৬ | ৬ | ২৯৫৭২ | ৬৯৫৮ |
| ১৯৮১-৮২ | ৮৪৬৪ | ১৮৪৮ | ৬১৯ | ৫৯৬ | ২১০৩১০ | ৬৯১৪০ | ৬ | ৩০৪১৭ | ৬৬৩৭ |
| ১৯৮২-৮৩ | ৮৫২৫ | ১৭১৭ | ৬২৯ | ৫৯৫ | ৩০০৪০২ | ৭২৯৬২ | ৬ | ৩২২৫১ | ৭৩৪৮ |
| ১৯৮৩-৮৪ | ৮৬৬৪ | ১৭৯৪ | ৬৭৬ | ৯৫৫ | ৩২৩১৪৭ | ৭৪৩৫৫ | ৬ | ৩০৫৬৩ | ৬৫১৫ |
| ১৯৮৪-৮৫ | ৮৫৫১ | ১৮৫৩ | ৭৫৫ | ৬৫৭ | ৩৪২৪২২ | ৯২৮৪৮ | ৬ | ২৮৭৯৭ | ৬৫৮৮ |
| ১৯৮৫-৮৬ | ৮৬৪৯ | ১৮৬৬ | ৭৭২ | ৬৮৭ | ৪২২৬৯৩ | ১১৮০০৪ | ৬ | ২৮৩৭৮ | ৭১১৫ |
| ১৯৮৬-৮৭ | ৮৭৯৩ | ১৯৪১ | ৮০৪ | ৭৮৮ | ৪০০০১১ | ১৫০৮৯৭ | ৬ | ২৮২৬৬ | ৭২২৯ |
| ১৯৮৭-৮৮ | ৮৯৮৩ | ২০৫৩ | ৯০৯ | ৮৩৩ | ৫১৬৯৯৪ | ১৬৫৭১৪ | ৭ | ৩২৪৮৪ | ৮২৫৫ |
| ১৯৮৮-৮৯ | ৯১৭৭ | ২১৩০ | ১০১৪ | ৮৮৬ | ৫৩৯৬৭১ | ১৭১৫৩৫ | ৭ | ৩২৩৫১ | ৮৯০৪ |
| ১৯৮৯-৯০ | ৯৬৩০ | ২২৯৩ | ১১২৪ | ৮৮৬ | ৫১৫৭৬৮ | ১৭৪৩৪৯ | ৭ | ৩৬৭৯৭ | ৯৮৬২ |
| ১৯৯০-৯১ | ৯৮২২ | ২৩৪৫ | ১১৮০ | ৮৯৩ | ৫১৬০৯১ | ২১৩৮৪৬ | ৭ | ৩৬৯০৩ | ১০৯০০ |
| ১৯৯১-৯২ | ৯৭৩১ | ২২৯৭ | ১৩৬৫ | ৯৯৭ | ৫৫৩৫২১ | ২৪৮৮৭২ | ৯ | ৪০৬৯৭ | ১১৯২৩ |
| ১৯৯২-৯৩ | ৯৮২৯ | ২৪৮০ | ১৫২৯ | ১০৪৬ | ৬০৪৪৭১ | ২৭৫৩৩৭ | ৯ | ৪০৬৮৩ | ১২০৩৯ |
| ১৯৯৩-৯৪ | ১১৩৮২ | ৩০১৭ | ১৬৫৬ | ১০৩১ | ৬৩৭৬৪৮ | ৩২৪৭৪২ | ১১ | ৪৮৩৮১ | ১৪৬২৫ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ১১০১৯ | ৩০০৮ | ১৮৭৬ | ১২৬৮ | ৭০৭৮৬৩ | ৭৯৪৪৯১ | ১১ | ৮৯৭৯৯ | ২৭৫৬০ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১২৫৫৩ | ৩২০৪ | ২৩২৭ | ১২৪৫ | ১৫৯৪০৬০ | ৭৯৪৪৯১ | ১১ | ১০১৬৩৮ | ৩৩১৭৫ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ১২৮৫৮ | ৩২৭৭ | ২৫১১ | ৩০৩২ | ১৬৭২১১৪ | ৮৩০৪৮৯ | ১১ | ৫০৮৭২ | ১৫২০৩ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ১৩০৮৭৮ | ৩২৩৯ | ২৭১৮ | ৩১২৩ | ১৭০৬২১৪ | ৮৬৭১২৫ | ১১ | ৫১০৯১ | ১৬১৮১ |

১) উৎস ঃ BANABEIS
২) District Education Officer, Ministry of Education
৩) University Grants Commission

শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে নারীদের শিক্ষাগত মান যতই উচ্চ পর্যায়ে উঠতে থাকে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে ততই নিম্নমুখী হতে থাকে। পরিসংখ্যানগত চিত্রে দেখা যায় যে, ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষিত হচ্ছে ১৭.২ ভাগ। ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ৮.২ ভাগ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২.৮ ভাগ এবং স্নাতক পর্যায়ে .০৮ ভাগ। এর বহুবিদ কারণের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কারণগুলো হলো দরিদ্র পরিবারের মানসিকতা, পর্দা প্রথা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততা (আখতার ১৯৯৫ ঃ ৩৩)।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা উল্লেখ করা হলেও এবং সকল নাগরিকের তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক মজুরী পাওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরাসরি নারীর অর্থনৈতিক শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। একজন নারীকে পরিবারে দৈনিক ১৬-১৮ ঘন্টা কাজ করতে হয়। কিন্তু এই সকল কাজের বিনিময়ে কোন নগদ অর্থ উপার্জন হয় না বলে তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে স্বীকৃত নয় এবং নারীর এ কাজকে শ্রমশক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় না। তাই পারিবারিক শ্রমের কোন সামাজিক মূল্য বা ক্ষতিয়ান পরিসংখ্যান নেই। আই,এল,ওর একটি হিসাব মতে নারীর গৃহ শ্রমকে যোগ করলে তা দেশের মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেক হবে।

আমাদের দেশের নারীর কাজ এবং পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য ও মজুরী বৈষম্য বিদ্যমান।

# সারণী–৩

## শ্রমবাজারের বিভিন্ন খণ্ডে পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকদের শ্রমঘণ্টা এবং মজুরির পরিমাপ

| শ্রমবাজারের বিভাজন | পুরুষ মাসিক মজুরির পরিমাণ (টাকা) | দৈনিক শ্রম ঘণ্টা | মহিলা মাসিক মজুরির পরিমাণ (টাকা) | দৈনিক শ্রম ঘণ্টা | উভয় মাসিক মজুরির পরিমাণ (টাকা) | দৈনিক শ্রম ঘণ্টা | পুরুষের মজুরিতে মহিলাদের অংশ (মহিলাদের আয় পুরুষের আয় ১০০) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শ্রম বাজারেরআইনী বিভাজন | | | | | | | |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ৫৭৬২ | ৮.৬ | ২৭৯২ | ৬.৭ | ৫৩৯৬ | ৮.৪ | ৪৮.৪৫ |
| অর্ধ প্রাতিষ্ঠানিক | ৪৩০২ | ১০.১ | ১০৯৮ | ১০.৯ | ২৯৭২ | ১০.৪ | ২৫.১৫ |
| অপ্রতিষ্ঠানিক | ৩০৩৮ | ৯.৮ | ৮২৩ | ১০.২ | ২৩২৯ | ৯.৯ | ২৭.১০ |
| সব খণ্ড | ৪৫২৫ | ৯.৩ | ১২৬২ | ৯.৯ | ৩৬২৮ | ৯.৫ | ২৭.৯০ |
| শ্রম প্রকৃতি অনুযায়ী অপ্রতিষ্ঠানিক শ্রম বাজারের পুর্নবিভাজন | | | | | | | |
| মজুরী শ্রমিক | ২০০৫ | ৯.৯ | ৫৭০ | ১০.৯ | ১১৬০ | ১০.৫ | ২৭.৪৭ |
| চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক | ২৭২০ | ১০.০ | ১৮১৭ | ৪.৭ | ২৬৬৮ | ৯.৯ | ৬৬.৮০ |
| স্বনিয়োজিত শ্রমিক | ৩৪০৪ | ৯.৭ | ২৬৭০ | ৪.৬ | ৩৩৬৩ | ৯.৩ | ৭৮.৪৩ |
| সব শ্রম প্রকৃতি | ৩০৩৮ | ৯.৮ | ৮২৩ | ১০.২ | ২৩৩১ | ৯.৯ | ২৭.১০ |
| কর্ম প্রকৃতি অনুযায়ী অপ্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মজুরী শ্রমের পুর্ণবিভাজন | | | | | | | |
| দক্ষ শ্রমিক | ৩০৭৩ | ১১.৭ | – | – | ৩০৭৩ | ১১.৭ | ০০.০০ |
| অদক্ষ শ্রমিক | ১৯৬৪ | ৯.১ | ৮২৬ | ১০.৭ | ১৪৮৪ | ৯.৭ | ৪২.২০ |
| গৃহশিক্ষক/সেলস্ম্যান | ২৮১০ | ৮.৫ | ৯৫০ | ৯.৮ | ২৪৫০ | ৮.৮ | ৩৩.৮০ |
| গৃহভৃত্য | ১০২৭ | ৯.৭ | ৫৪২ | ১১.০ | ৬৪০ | ১০.৭ | ৫২.৭৮ |
| সব বিভাগ | ২০৭৫ | ৯.৯ | ৫৭০ | ১০.৯ | ১১৬০ | ১০.৫ | ২৭.৪৭ |

**উৎস ঃ** Survey of Barriers to Womens Employment, 1992 BIDS

সারণীতে দেখা যাচ্ছে অপ্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সব চাইতে কম মজুরীর দীর্ঘ শ্রমঘন্টার কাজটি হচ্ছে গৃহভৃত্যের কাজ। আর এখানেই কোনঠাসা করা হয়েছে নারীদেরকে। শুধু মাত্র অপ্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও নারীদেরকে গুটিকয়েক স্বল্প মজুরির কাজে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে।

## সারণী– ৪

## কর্ম প্রকৃতি (type of activity) অনুযায়ী শ্রম বাজারের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রটির বিভাজন

| কর্মপ্রকৃতি | পুরুষের সংখ্যা | মহিলার সংখ্যা | উভয় | শ্রম ঘণ্টা | | | মাসিক বেতন | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুরুষ | মহিলা | উভয় | পুরুষ | মহিলা | উভয় |
| স্কুল/কলেজ/ ইউনিভার্সিটি | ২৯ (২.৭) | ৪১ (২৭.১) | ৭০ (৫.৭) | ৭.৭ | ৫.৪ | ৬.৭ | ৪৬০৯ | ৩০৫১ | ৩৬৯৬ |
| ব্যাংক বীমা | ৫১ (৪.৮) | ৮ (৫.২) | ৫৯ (৪.২) | ৯.৯ | ৮.৮ | ৯.৭ | ৭৩৯৩ | ৪০১৮ | ৩৯৩৫ |
| মন্ত্রণালয়/ পি.ডব্লিউডি টিএন্ডটি/ বিমান ইত্যাদি | ৩৫৭ (৩৩.২) | ২১ (১৩.৯) | ৩৭৮ (৩০.৪) | ৮.৪ | ৭.৮ | ৮.৩ | ৫৪১৪ | ২৪৬৭ | ৫১৫০ |
| হসপিটাল/ ক্লিনিক | ২৪ (২.২) | ১১ (৭.৩) | ৩৫ (১.৯) | ৮.১ | ৪.০ | ৮.১ | ৭৭৬৬ | ২১৬৩ | ৫৯৭৪ |
| আইন বিভাগ পুলিশ | ১০ (০.৯) | ১ (০.৬) | ১১ (০.০) | ৯.০ | ১০.০ | ৯.১ | ৪৩৭৭ | ৪৬০০ | ৮০৩৩ |
| পুলিশ বিভাগ | ১০৯ (১০.১) | ১২ (৭.৯) | ১২১ (৯.৯) | ৯.৪ | ৮.৩ | ৯.৩ | ৩০৫৪ | ২১৯৬ | ২৯৬৯ |
| ফার্ম/ কোম্পানী | ৩১৪ (২৯.৩) | ১৭ (১১.৩) | ৩৩১ (২৭.০) | ৮.৯ | ৭.৮ | ৮.৮ | ৮৩০৬ | ২৭০৪ | ৮১২৩ |
| NGO/ আন্তর্জাতিক সংস্থা | ১৯ (১.৮) | ২৪ (১৫.৮) | ৪৩ (৩.৫) | ৮.৮ | ৬.৫ | ৭.৫ | ৬৭৪৭ | ৩৭০৪ | ৫০৪৭ |
| ফ্যাক্টরি (পোষাক কারখানা ছাড়া) | ১০৮ (১০.১) | ৬ (৪.০) | ১১৪ (৯.৩) | ৮.৭ | ৯.৩ | ৮.৭ | ১১০৮ | ১৬৯১ | ২০৪০ |
| অন্যান্য | ৫৪ (৫.০) | ১০ (৬.৬) | ৬৪ (৫.২) | ৫.৬ | ২.১ | ৫.০ | ২৭৮৩ | ১৪১৬ | ২৫৬৯ |
| সব কর্মপ্রকৃতি | ১০৭৫ (১০০.০) | ১৫১ (১০০.০) | ১২২৬ (১০০.০) | ৮.৬ | ৬.৭ | ৮.৪ | ৫৭৬২ | ২৭৯২ | ৫৩৯৬ |

উৎস ঃ Survey of Barriers to Womens Employment 1992 BIDS.

সারণীতে দেখা যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীদের মধ্যে ২৭ শতাংশই নিয়োজিত আছেন স্কুল/কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালযে অথচ পুরুষদের মাত্র ৩ শতাংশ এই কর্মে নিয়োজিত। অথচ মজুরির পরিমাণ তুলনা করলে এই কর্মের স্থান অনেক নীচে চলে যায়। পুরুষ শ্রমিকদের প্রায় ৬৩ শতাংশ যে দুই জায়গায় (মন্ত্রণালয়/কর্পোরেশন, ফার্ম অথবা কোম্পানী) সমৃদ্ধ আছে সেখানে মাসিক আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। অথচ এই কাজে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মাত্র ২৫ শতাংশ নিয়োজিত আছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীরা কেবল স্বল্প মজুরি এবং অধিকতর শ্রমশোষণের ক্ষেত্রগুলিতেই সীমাবদ্ধ নন। এই ক্ষেত্রটিতে তারা আরও অসুবিধাজনক অবস্থায় কোনঠাসা হন যখন তাদেরকে নিয়োগ করা হয় কেবল মাত্র কয়েকটি পদে। এমনকি যে ক্ষেত্রগুলো নারী শ্রমিক দ্বারা অধ্যুষিত সে ক্ষেত্রগুলোতেও নারী শ্রমিকরা উচ্চ পদে নিয়োগ পান না। দেখা গেছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের প্রায় ৭০ শতাংশই হচ্ছে নারী অথচ ঐ শিল্পে উচ্চ পদে (কাটিং মাস্টার সুপারভাইজার ইত্যাদি) নিয়োজিত নারীদের সংখ্যা খুবই কম। অন্যান্য শিল্পের মতো এই শিল্পের নারীরা কেন্দ্রীভূত আছেন অদক্ষ শ্রমিকদের পদ গুলিতে যেখানে মজুরির পরিমাণ উচ্চ পদগুলির চাইতে অনেক কম।

## সারণী– ৫

## পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক শ্রমিকদের বিভাজন

| পদমর্যাদা | পুরুষ | মহিলা | উভয় | মহিলাদের অংশ | মাসিক মজুরির পরিমাণ (টাকা) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | পুরুষ | মহিলা | পুরুষের মজুরিতে মহিলার অংশ (পুরুষের মজুরির পরিমাণ÷মহিলার মজুরির পরিমাণ X ১০০ |
| কাটার/সুপারভাইজার/ কোয়ালিটি কন্ট্রোলার | ২৭.৩ | ৮.২ | ১৫.৫ | ৩৪.৬ | ২৪০১ | ১৯৯০ | ৮২.৯ |
| অপারেটর | ১৫.৯ | ৪৪.০ | ৩৪.০ | ৮৩.০ | ১২৩৭ | ১০৬৯ | ৮৬.৪ |
| হেলপার | ৩০.২ | ৪১.৩ | ৩৭.৩ | ৭০.০ | ৭৫৮ | ৫৬২ | ৭৪.২ |
| আয়রনার | ১২.৭ | ১.২ | ৫.৪ | ১৩.৯ | ৯৭১ | ৫৪০ | ৫৫.৬ |
| ফোল্ডার | ১৩.৯ | ৪.৯ | ৮.২ | ৩৪.২ | ৯৯৭ | ৮০৪ | ৮০.৬ |
| সব পদ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ৬৩.৫ | ১৩৪৪ | ৮৮৬ | ৬৫.৯ |
| সংখ্যা | ২৪৫ | ৪২৬ | ৬৭১ | – | – | – | – |

উৎস ঃ Survey on Socio-economic Condition of Garment Workers in Bangladesh শীর্ষক জরিপ বিআইডি এস ১৯৯০।

নারী সাধারণতঃ কোন পদোন্নতি বা মজুরি বৃদ্ধি ছাড়াই একই পেশা বা পদে কাজ করে যান সারা জীবন ধরে, শুধু তাই নয় যেহেতু ক্রমবর্ধমান নারী শ্রমিকরা একই পেশাতে ভিড় জমাচ্ছেন সেহেতু সেই পেশার প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির চাইতে ক্রমাগত হ্রাসই পেতে থাকে। দেখা গেছে পোশাকশিল্পের ১৯৯০ সালে সর্বনিম্ন পদে মজুরি যা ছিল তাই আছে অথচ কাটার, সুপার ভাইজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার ইত্যাদি উচ্চ পদে যেখানে নারীর অংশ গ্রহণের অতি সামান্য সেখানে গড় মজুরি ঠিক একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ (মজুমদার ১৯৯৮)। ১৯৭৬-১৯৮৫ সন এই সময়কালকে নারী দশক হিসাবে আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘ তার সকল সদস্য রাষ্ট্রের কাছে নিজ নিজ দেশে নারীদেরকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা দেয়ার আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয়, এই জন্য জাতিসংঘ, নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অনুমোদন সংক্রান্ত সনদ বা দলিল তৈরি করে তাতে সদস্য রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি ও স্বাক্ষর দানের আহ্বান জানায়। এর ফলে বাংলাদেশ ও আংশিকভাবে এই সনদে স্বীকৃতিদান করে। স্বীকৃতি দানের কারণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া এবং সেই অঙ্গীকার পালনের দায়দায়িত্ব নিয়েই আজ কর্মক্ষেত্রে নারীদের সীমিতভাবে হলেও সুযোগ দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার কারণেই নয় কর্মক্ষেত্রেই অংশগ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য দেশের ভিতরে নারীদের অব্যাহত দাবী, বাঁচার তাগিদে জীবন ধারণ এবং জীবন যাপনের বাস্তব প্রয়োজনে নারীদের এই দাবীকে সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে সক্রিয় সমর্থন দেয়ার কাজটিও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে আসছে। কাজের সন্ধানে নারীদেরকে কাজ খোঁজার পরামর্শ কিংবা উৎসাহ দেয়াই শুধু নয়, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে একে কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করার ইঙ্গিতও দেয়া হচ্ছে। আর তাই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের বিষয়টি যেমন আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে জোরদার হয়ে উঠেছে তেমনি দেশের ভেতর ও এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এছাড়াও বিয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য হলেও কর্মজীবী কুমারী মেয়ে কর্মহীন কুমারী মেয়ের তুলনায় পাত্রী বিবেচনায় খানিকটা বেশি মর্যাদা পায়।

নারীরা ঘোষিত এবং অঘোষিতভাবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দৃঢ়ভাবে যে মূল ভূমিকা পালন করছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কৃষি কাজে তাদের ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির ৬৮ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। নারী শ্রমও শক্তির মধ্যে ৮৮ শতাংশ শ্রম দেয় মজুর হিসাবে। নারী সাধারণত চাষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যেসব কাজ করে থাকে সেগুলো হচ্ছে বীজ সংরক্ষণ, বীজ বপন ও চারা রোপন, আগাছা পরিষ্কার ক্ষুদ্রাকৃতির সেচকাজ, ফসল কাটা মাড়াই ও মাড়া প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অকৃষি কাজের দিকেও নারীদের দৃষ্টি দিতে হয়েছে। ১৯৮০ সালের মানব সম্পদ জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী

অকৃষি কাজের বিভিন্নভাগে অর্থাৎ অকৃষি কাজে স্বনিয়োজিত অকৃষি শ্রমিক এবং গৃহকার্যে নিয়োজিত কর্ম নিয়ে মোট ৪৭.৭৭ শতাংশ নারী কর্মরত রয়েছে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যদিও সরকারী কর্মকাণ্ড হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ কর্মকাণ্ডের আঁধার তবুও এই কর্মকান্ডে পুরুষ ও নারীর সমভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এখনো মেয়েদের অনেক দূরের পথ অতিক্রমের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারী চাকরিতে কোটা প্রবর্তন করা হলেও এখন পর্যন্ত সরকারের নীতি নির্ধারণী পদে নারীর অংশ গ্রহণ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশে সরকারী আধা সরকারী অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০৯৭৩৩৪, তার মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৮৩১৩৩, জন অর্থাৎ শতকরা ৭.৬। এর মধ্যে গেজেটেড পদে শতকরা ৬.৫ ভাগ এবং অন্যান্য পদে শতকরা ৭.৪ ভাগ নারী। উপসচিব পদ হতে সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নারীর সংখ্যা শতকরা ১ ভাগেরও নীচে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সমতুল্য পদসহ সচিবদের পদ ৬৪টি। অতিরিক্ত সচিবের পদ ৬০টি। এই পদ সমূহে ২ জন মাত্র নারী রয়েছে। ২৯৫টি যুগ্ন সচিব পদের মধ্যে ২জন নারী এবং ৬৬৫জন উপসচিবের মাধ্যে ৩ জন মাত্র নারী রয়েছেন। বিসিএস এর অন্যান্য ক্যাডারেও উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা নগন্য। রাষ্ট্রতদূত পদে মাত্র একজন নারী বর্তমানে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। হাইকোর্টে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন একজন নারী। বিশ্ব বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচন কমিশনে উচ্চ পদে কোন নারী নেই। এছাড়া বিভিন্ন স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার উচ্চ পদে অতি সীমিত সংখ্যক নারী নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ নারী। পুলিশ বিভাগে নারীদের এ এস পি সহ অন্যান্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় বিগত কয়েক বৎসর ঐ পদে নিয়োগ বন্ধ ছিল। এছাড়া পুলিশ বিভাগে অন্যান্য পদে ও নারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম। সেনাবাহিনীতে নারীদের নিয়োগ একেবারেই সীমিত।

পুলিশ ও আনছার বাহিনীতে প্রথম নারীদের নিয়োগ করা হয় ১৯৭৬ সালে। ১৯৮৭ সনের এক রিপোর্টে দেখা গেছে মোট ৭৫ হাজার জন পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনীতে ১৪৬ জন নারীকে কর্মকর্তা হিসাবে এবং ১২২ জন নারীকে ব্যাংক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আনছার বাহিনীর সারা দেশে ১০ হাজার কর্মী রয়েছে তার মধ্যে প্রতি জেলায় ২ জন নারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করে তাদের আওতায় দুইটি করে নারী প্লাটুনকে কাজ করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে।

প্রতিটি গৃহস্থালী ক্ষেত্রে সনাতন লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজমান। নারীরা দিনের বেশিরভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকে ঘরের বিভিন্ন কাজে অন্য দিকে পুরুষদের ব্যস্ততা হলো বাইরের কাজে। গৃহস্থালীর কাজে নারীদের দেয়া সময়ের চাইতে পুরুষদের

দেয়া সময় খুবই কম। এমনকি উপার্জনক্ষম নারীর ক্ষেত্রেও গৃহস্থালী কাজের ধরণ পরিবর্তিত হয় না। যেসব পরিবার বেতনভোগী গৃহ শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে না সেক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম নারীকে বাড়তি শ্রম ও চাপের বোঝা বহন করতে হয়। যে সকল পরিবারে বেতন ভোগী গৃহ শ্রমিক রাখা হয় সেখানে কর্মজীবী নারীর কাজের বোঝা আংশিকভাবে তার স্বজাতি আরেকজনের উপর বর্তায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিবারের নারীর ক্রমবর্ধমান উপার্জনশীল ভূমিকা তার স্বামী অথবা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের কর্মতৎপরতায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না।

বাংলাদেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী। নগরের দরিদ্র নারীরা দরিদ্র পুরুষদের তুলনায় অধিক হারে দারিদ্রের দুঃখ কষ্টগুলো ভোগ করে থাকে। আবাসন সমস্যা যা নগর দরিদ্রদের একটি অন্যতম সমস্যা এর বেশির ভাগই ভোগ করে দরিদ্র নারীগোষ্ঠী। কারণ তাদেরকেই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা বস্তির গন্ধময় পরিবেশে কাটাতে হয়। পুরুষরা কর্মের সুবাদে দিনের অধিকাংশ সময়ই থাকে বস্তির বাইরে।

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেলেও আমাদের দেশের অনেক মানুষ তাদের দরিদ্রতার কারণে বস্ত্রের মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এক্ষেত্রেও নারীর পুরুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একটি জরিপে প্রকাশিত হয়েছে ৮২.৮৬% উপার্জনকারী পুরুষের তুলনায় মাত্র ৫০.৬০% উপার্জনকারী নারী তাদের চাহিদা অনুসারে কাপড় চোপড় কিনতে পেরেছেন। এ থেকে একটা কথা পরিস্কার হচ্ছে যে, অর্থ উপার্জনকারীর ভূমিকা নেয়া সত্ত্বেও নারী সমাজ দারিদ্র অতিক্রম করতে পারেনি। আগারগাঁও বস্তিতে পরিচালিত জরিপের তথ্য হতে দেখা যায় এক মাসে নারী সদস্যের পোষাকের জন্য যেখানে গড়ে মাথাপিছু খরচ হয়েছে ৭.৫ টাকা, সেখানে পুরুষ সদস্যের জন্য খরচ হয়েছে ১২ টাকার ঊর্ধ্বে (মজুমদার ১৯৯২ ঃ ৯২)।

প্রতিমাপাল মজুমদার তার "নগর দারিদ্র সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা" গ্রন্থে (১৯৯২ ঃ ৯৩) বলেছেন নগরীর বস্তিগুলির শতকরা ১৪টিতেই কোন পায়খানা নেই। বাকী ৮৬টি বস্তিতে যে পায়খানা আছে তার প্রতিটি ২৫-৫০ জন বস্তিবাসী ব্যবহার করে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নারীদের প্রাত্যহিক কৃতকর্ম সম্পাদন যে কঠিন কাজ তা অনুমান করা কঠিন নয়। ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে তারা সারাদিনের জন্য কর্ম সম্পাদন করে। কারণ দিনের আলোতে আব্রুহীন পায়খানা তারা ব্যবহার করতে পারে না। অন্যান্য ভৌত সুযোগ সুবিধাগুলির অভাবও তারা বেশি ভোগ করে থাকে। যেমন, নগর দরিদ্রদের পানি ও জ্বালানী কষ্ট প্রায় এককভাবে নারী ভোগ করে থাকে। তাছাড়া এই সব দরিদ্র মহিলারা প্রায়ই নারী ব্যবসায়ী ও মাস্তানদের ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন। এ বৈষম্যের শিকার হয়ে নগরের নারীগোষ্ঠী যে তাদের সতীর্থ পুরুষের তুলনায় আরো অধিকতর মানবেতর জীবন যাপন করে তা বলাই বাহুল্য।

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশের ৫৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্য সুবিধা নাগালের বাইরে অবস্থান করছে এক্ষেত্রেও নারীপুরুষের মাঝে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এদেশের প্রসুতি এবং গর্ভবতী মায়েদের অবস্থা খুবই নাজুক। এখানে মধ্য আয়ের পরিবারের তিন চতুর্থাংশ এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের প্রায় ৯৫ শতাংশ গর্ভবতী নারীদেহের ওজন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ৭৫০ কিলোগ্রামের কম। অর্থাৎ মধ্য আয়ের পরিবারের প্রতি চারজন গর্ভবতী মায়ের মধ্যে তিনজনই অপুষ্টির শিকার। যার ফলশ্রুতিতে তারা আরও অপুষ্টি অসুস্থ্য ও স্বল্প ওজনের বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। এদেশের নবজাতকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই ওজন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ২.৫ কিলোগ্রামের চেয়ে কম। ফলে নবজাত শিশু মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। বাংলাদেশের প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ছেলেদের ক্ষেত্রে যেখানে ৯৫ জন মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ১০২ জন। পুষ্টিহীনতার হার বালকদের মধ্যে ৫ শতাংশ এবং বালিকাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ।

বাংলাদেশে সাধারনতঃ বিশ বছর বয়সে পড়ার আগেই ৬০ শতাংশ নারী সন্তানধারণ করে এবং এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ গর্ভকালীন বা প্রসবের জটিলতায় মৃত্যু বরণ করে। অনিরাপদ প্রসব ব্যবস্থা অথবা প্রসব পূর্ব ও প্রসবোত্তর যথাযোগ্য সেবা যত্নের অভাবে ২৭ শতাংশ নারীর মৃত্যু ঘটে। প্রতি ১০০ জীবন্ত প্রসবে প্রসূতি মৃত্যুর হার ৫ থেকে ৬ জন। মাতৃত্ব সংক্রান্ত জটিলতায় প্রতি ঘণ্টায় ৩ জন এবং বছরে ২৮০০ মা মারা যায় যাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের নারী। ২৮০০ এর মধ্যে ১১% একলাম্পসিয়া ১৯%, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ১৪%, গর্ভপাত ৬%, ব্যথা দীর্ঘায়িত হয়ে, ৮%, সেফটিক ও ১১% অন্যান্য কারণে মৃত্যু বরণ করে থাকে [UNICEF, The women Friendly Hospital Initiative 1998] উল্লেখিত কারণগুলির প্রায় সবই উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে দুর করা সম্ভব হলেও এদেশের অধিকাংশ নারী এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র এবং অপুষ্টি ছাড়াও সামাজিক পর্দা প্রথা নারীদের ন্যূনতম সুযোগ হতে বঞ্চিত করে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক সময় প্রসূতি মায়েদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় না। কিন্তু দেখা গেছে যে, যদি নারীদের সময়মত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো তবে অনেক মহিলাই প্রসবকালীন মৃত্যু থেকে রেহাই পেতেন।

সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নারী পুরুষদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এখানে সাংস্কৃতিক অধিকার একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক ও জন জীবনে নারীর নিজেকে গড়ে তোলার স্বাধীনতা, নিজের পছন্দমতো সম্পর্ক স্থাপন এবং যোগাযোগের স্বাধীনতা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের স্বাধীনতা, খেলাধুলা, নাচ গান অথবা অন্য যে কোন বিনোদনমূলক বিষয়ে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি শিক্ষার অধিকার, এসব কিছুই একজন ব্যক্তির সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে গড়ে

তোলার প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত। আগারগাঁও বস্তিতে পরিচালিত একটি জরিপের তথ্য হতে দেখা যায় যে, আমোদ প্রমোদের জন্য পুরুষ সদস্যরা যেখানে খচর করেছে গড়ে মাথা পিছু ২.৬ টাকা, সেখানে নারী সদস্যরা এই খাতে গড়ে মাত্র ০.১৫ টাকা খরচ করে থাকেন। এছাড়া আরো দেখা গেছে পুরুষ শ্রমজীবীরা ঘরের বাইরে খাবারের জন্য দৈনিক প্রায় ৭ টাকা খরচ করে কিন্তু নারী শ্রমজীবীরা এক পয়সাও এ খাতে খরচ করে না। (মজুমদার ১৯৯২ ঃ ৯৩)।

বাংলাদেশের নারীদের প্রান্তিক অবস্থানের একটি ক্রিয়াশীল উপাদান হলো উত্তরাধিকার প্রথা বা সম্পত্তির মালিকানা। মুসলমান সমাজে কন্যা সন্তান পুরুষ সন্তানের চেয়ে পিতৃ-সম্পত্তির অংশ কম পায় এবং স্ত্রী স্বামীর অবর্তমানে সন্তান সন্ততির চেয়ে স্বামীর সম্পত্তির অংশ কম পায়। ধর্মস্বীকৃত এই উত্তরাধিকার প্রথা পিতৃতন্ত্রে নারীদের পদস্তর সৃষ্টি করে। তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পদ যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশি রাখে। বাংলাদেশে ভূমি এবং এর ব্যবস্থাপনা পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত নারীদের হাতে নয় যা পুরুষদেরকে ক্ষমতাধিকারী করে তোলে।

অর্ধেক মানব সম্পদ, মজুদ শ্রম বাহিনী এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। জাতীয় জীবনে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ যেমন বাঞ্চনীয় তেমনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া উৎপাদন ও সমতাবিধানে রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

## সারণী– ৬

## বর্তমান রাজনীতিতে নারীর অবস্থান

| দেশের নাম | মোট আসন সংখ্যা | মহিলা (জন) | সদস্য) |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৩৩০ | ৩৭ | ১১.২ |
| ভারত (নিম্নকক্ষ) | ৫৪৩ | ৩৯ | ৭.০০ |
| মালয়েশিয়া | ১৯২ | ১৫ | ৭.৮ |
| পাকিস্তান | ২১৭ | ৬ | ২.৮ |
| সিঙ্গাপুর | ৮৭ | ৩ | ৩.৪ |
| শ্রীলংকা | ২২৫ | ১১ | ৪.৮ |

উৎস ঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বি.সি.এস গাইড ২০০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান আশাব্যঞ্জক। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতিতে বেশ অগ্রগামী। যদিও নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন শতকরা হিসাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও আশার কথা হলো, আমাদের মধ্যে নারী সচেতনতা বৃদ্ধির ফলেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে সরকারি ও বিরোধী দুদলেরই প্রধান নারী। বাংলাদেশের মন্ত্রী সভায় ৪ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০ জন সদস্যসহ ৩৭ জন নারী। স্থানীয় সরকারে ১৩৮৭৯ জন নারী বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। তবে এদের অধিকাংশই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর আরো সক্রিয়তা সুস্থ রাজনীতির জন্য অতীব দরকার। কারণ মানবীয় দিকসমূহ যেমন সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উপর নারীর ঝোঁক বেশি থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষদের তুলনায় নারী কম দুর্নীতি পরায়ণ। দুর্নীতি যেখানে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, সেখানে সৎ রাজনীতিবিদদের দরকার খুব বেশি। অসৎ রাজনীতিবিদদের খপ্পরে পড়ে রাজনীতি তার নীতি হারাতে বসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি জাতিসংঘ স্টাডিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায় রাজনীতি ও ক্ষমতায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতার পক্ষে বলা হয়েছে যে, নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রথমতঃ গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন।

দ্বিতীয়তঃ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনৈতিক অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে কেননা রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশ গ্রহণের কারণে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় বিরাট ব্যবধান। তৃতীয়তঃ নারী পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নারী তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত। কিন্তু রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব যদি না থাকে তাহলে নারী তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর্থতঃ ব্যাপক সংখ্যক নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তণ ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা নারীর জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আওতা বহির্ভুত বলে বিবেচিত সেগুলোও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে। সর্বশেষে দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সকল উপস্থিতি আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও অতীতের তুলনায় বর্তমানে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আজও অনেক নারী সুষ্ঠুভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না।

নারীর পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য শুধুমাত্র দৈহিক ভিন্নতার জন্য হয়নি। হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি ব্যবস্থার কারণে। পিতৃতন্ত্রীয় পরিবার ও সমাজ কাঠামোর এ দেশের নারীদের অবস্থান অধঃস্তন। আবহমান কাল ধরে এদেশের নারীগণ যথাক্রমে বাধ্যগত কন্যা জায়া ও জননী হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে নারীকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মর্যাদা দেওয়া হলেও প্রকৃত পক্ষে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা নিকৃষ্ট পর্যায় বিদ্যমান। বাংলাদেশের নারীরা একটি রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করেন। কেউ কেউ এ সমাজ ব্যবস্থাকে পর্দাশাসিত বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। পর্দা শব্দটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গৃহের সংকীর্ণ পরিসরের বাইরে সুযোগ সৃষ্টিতে প্রচলিত আইন কানুন, রীতি-নীতি প্রথা ইত্যাদি যে সকল প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে নারীদের গৃহবন্ধী করে রাখার অনুকুলে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাকেই অনেকে পর্দার শাসন বলে অভিহিত করতে চান। বাংলাদেশের নারী সমাজ এ ধরনের শাসনের শিকার।

আমাদের দেশের দারিদ্রের শিকার শুধুমাত্র নারীরাই নয়, পুরুষরাও এর শিকার। তবে দীর্ঘ সময়ের পরিসরে পুরুষেরা যতখানি এগিয়েছে সে তুলনায় নারীরা পারেনি। নারীও যে পুরুষের পাশাপাশি সংসারের অঙ্গন থেকে নারী অঙ্গনে তাদের যোগ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম, বিশ্বব্যাপী তার স্বীকৃতি থাকলেও নারীরা দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যে বঞ্চনা শুধু নির্দিষ্ট একটি দেশেই নয় বরং বহু দেশেই রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলেও তা যৎসামান্য। লিঙ্গ সাম্য আনার জন্য দরকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভূত্বমুলক মনোভাবের বিলোপ সাধন করা। বিশ্ব ব্যাপী নারী আন্দোলনের চাপে আজ নারীরা বহু আইনী অধিকার পেলেও দৃঢ়মূল সামাজিক অসাম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে সেই সমতাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন মূলক সকল কর্মকাণ্ডে তারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে কাজ শুরু করতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরনের উপায় হলো এদেশের নারীদের উন্নয়ন করা। কারণ, নারীদের উন্নয়নের মাধ্যমেই একটি পরিবার, সমাজ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

## *তথ্য নির্দেশ ঃ*

A, Jarmine, *Women's Role in Bangladesh : A Programme Assessement*, Ford Foundation, Dhaka, Bangladesh.

Begum, N Nur, *Pay or Purdah, Women and Income Earning in Rural Bangladesh,* Studies in Devlopmint and Social Change, Dhaka 1998.

Begum, N Nur, *Participation of Women in Traditional Textiles in Bangladesh, Volume- 8,* Number- 1, I. S.W.R- Din December 1993.

*B.B.S Pocket Book,* Government of Bangladesh, 1998

Chowdhury, R Huda and Ahmed, N Reihan, *Famale Status in Bangladesh (1980)*

*Human Development Report, 1997*

Islam, Mahmuda, *Women Health and Culture,* Women for Women, 1995.

Islam, Ayesha, *Status of Women and Fertility in Bangladesh,* Dhaka; The University Press Limited, 1983

*The 5th YR,* Plan 1997- 2000, Bangladesh.

*Unicef,* The Women Friendly Hospital Initiative, 1998.

আখতার, তাহমিনা, *বাংলাদেশের নারী শিক্ষার কতিপয় সমস্যা ও সম্ভাবনা,* বর্ষ ১১, সংখ্যা ডিসেম্বর স, ক, গ, ই ঢাঃ বিঃ ১৯৯৬।

*স্মরণিকা,* আন্তর্জাতিক নারী দিবস, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৮ইং মার্চ ১৯৯৯

আনম, মাহমুদুর, "বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা, ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৯১/৯২ ঃ অর্জিত লক্ষ্য মাত্রা ও আর্থ সামাজিক নির্ণায়কসমূহ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* দ্বাদশখণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৫।

বেগম, এন নূর, *উপার্জন ও সামাজিক অবস্থান ঃ নীলগঞ্জের মহিলা,* নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা ১৯৯২।

*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,* অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৯৮।

মান্নান, এম, এ, "মানব উন্নয়নসূচক এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* পঞ্চদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৮।

মজুমদার, প্রতিমাপাল, "শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন মুখিতা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* পঞ্চদশ খণ্ড, বার্ষিক ১৯৯৮।

রহমান, আর ইসলাম, *দারিদ্র ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* বিআইডিএস, ঢাকা ১৯৯৭।

সাবাহ, সালেহ, *গ্রামীণ শ্রমজীবী নারী,* প্রতিপক্ষ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৬।